Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কিশোর-তিতাস-অনন্ত

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মিথুন ব্যানার্জী
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.6
Pages	১০৯-১২০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কিশোর-তিতাস-অনন্ত

Check for updates

মিথুন ব্যানার্জী*

উপন্যাসের ডিসকোর্সে সংরক্ষিত থাকে এর স্বভাব, প্রবণতা ও পরিণতি। তাই নদীকে ঘিরে নদীরই মতো এঁকেবেঁকে যে উপন্যাসের বিকাশপথ নির্ধারিত হয়, তার নান্দনিক ব্যবচ্ছেদ সংগত কারণেই হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। এমনই নদীস্বভাবী এক উপন্যাস *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬)। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা আর সাহিত্য-অভিজ্ঞতাকে এই উপন্যাসে এক অভিন্ন স্রোতধারায় বাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসের ন্যারেটিভের পরতে পরতে ঔপন্যাসিক সুবিন্যস্ত করেন তাঁর মনোপলব্ধিজাত বীক্ষা। বিশেষ করে, এপিসোডিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট রচনাটির পর্ব থেকে পর্বান্তরের ক্রমধারাবাহিকতায় লেখক আত্মজ অভিব্যক্তির প্রাতিস্বিক রূপায়ণে নিয়োজিত হন। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটিও এপিসোডিক হিসেবে শনাক্তকৃত (দ্র. গুণময়, ১৯৯৯ : ৬৭; শুভঙ্কর, ১৯৯৯ : ৮৩)। উপন্যাসটিতে অদ্বৈত তিতাস নদীর দেখিয়ে যাওয়া পথে একের পর এক এপিসোড পূর্ণ করেন এবং এভাবেই তিনি নিজ যাপিত জীবন আর ভাবী সময়কে যুগল স্রোতে বাহিত করেন; এর মধ্য দিয়ে জবাব পেতে চান বিনির্মিত আত্মজিজ্ঞাসার। তাই উপন্যাস পাঠের সূত্র ধরে পাঠক জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে এই ভেবে: তিতাস কি সত্যিই কেবল একটি নদীর নাম, না-কি নদীময় এক অফুরান সজীবতার শিল্পকাহন। নদী-নিয়ন্ত্রিত জীবন কাঠামোয় এই নিগূঢ় প্রাণময়তার অনুসন্ধানে বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রীয় মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকবে দুটি মানুষ কিশোর আর অনন্ত। কীভাবে গোষ্ঠীজীবন সময়ান্তরের অভিযাত্রায় অংশ নেয়, বারবার পাল্‌টে নেয় তার গতিপথ — নদীবেষ্টিত জীবন-সংহিতার অপূর্ব নির্মাণ-নৈপুণ্যে কিশোর এবং অনন্তকে আশ্রয় করে তা-ই ঠাস-বুনোটে ধারণ করে আছে এই উপন্যাস।

উপন্যাসের শুরুতে অদ্বৈত তিতাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন — 'তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৩৯)। এত উচ্ছল বর্ণনা, যা পড়ে এক টগবগে তরুণের ইমেজ আমাদের মনে তৈরি হতে শুরু করে, তা আবার হারিয়ে যায় লেখকের নিরাবেগ অভিব্যক্তিতে — 'তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটি নদী' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৩৯)। এই বৈপরীত্য আমাদের অস্পষ্ট করে দেয়। কিংবা এ-হয়তো আরো কিছু বেশি করে স্পষ্ট করবার কোনো কৌশল! তিতাস যে কেবল একটি নদী নয় সেই তথ্যটিকে জানাতে চান বলেই এমন দ্ব্যর্থবোধক অভিব্যক্তির আশ্রয় নেন লেখক। মোট কথা, তিতাসকে নিয়েই আসলে এই উপন্যাসের সবকিছু আবর্তিত, ক্রমবিকশিত। তাই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের চরিত্রেও সম্প্রসারিত হয় তিতাসের স্বভাব। আবার তিতাসও হয়ে ওঠে উপন্যাসের একটি চরিত্র। তিতাস সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়, বিবর্তিত হয়। নদীর পাড় ছুঁয়ে, মালো পাড়াকে সাথে নিয়ে এগিয়ে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

যায় তিতাস। নদীজীবী মালোদের জীবন আর জীবিকা, প্রাত্যহিক জীবনাচার, অন্তহীন স্বপ্ন আর অনিবার্য পরাভব নিয়ে বয়ে চলে তিতাস। এই নদীরই মতো করে কখনো বিপুলতায় কখনোবা শীর্ণতায় বয়ে চলে দুটি জীবন। ঔপন্যাসিক তাঁর অন্বিষ্টকে, কিশোর আর অনন্তের জীবনকে তিতাসের জীবন-প্রবাহের মাঝে মেলে ধরতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন; উদ্ভাসন ঘটান জীবনদায়িনী তিতাসের। জীবনপ্রবাহের ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হয় কিশোর-তিতাস-অনন্ত।

২.

নদীবিধৌত বাংলা অঞ্চলের সাহিত্য বিশেষ প্রবণতায় নদীকে আশ্রয় করে শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে। নদীর সমান্তরালে বাহিত জীবন বিভিন্ন সময়ে উপজীব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে। নদীকে নিয়ে রচিত উপন্যাসপুঞ্জের মধ্যে বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) এবং সমরেশ বসুর *গঙ্গা* (১৯৫৭)। পদ্মা ও গঙ্গা মূলত অভিন্ন উৎস-আশ্রয়ী দুই নদী। *পদ্মানদীর মাঝি* নদীপাড়ের জলজীবী মানুষের নিত্য টানাপড়েন, তাদের দ্বান্দ্বিক মনস্তত্ত্ব, প্রবৃত্তির ব্যাতিচার এবং সর্বোপরি সংঘাত ও সমঝোতার ডিসকোর্স। *গঙ্গা*-তে আবার পাওয়া যায় সংগ্রামী লড়াকু জীবনবাদী মানুষের ছবি। নদীর রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এর তীরবর্তী মানুষগুলোও পরিবর্তমান জীবনমুখী প্রবণতা নিয়ে অগ্রসর হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে, *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর জীবনগাথা একেবারেই স্বতন্ত্র — আর তা যেন নদীরই সপ্রাণ প্রতিবিম্ব; উপন্যাসের প্রবাহও নদী-প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম। তাই *পদ্মানদীর মাঝি* বা *গঙ্গা* উপন্যাসে যেখানে উপন্যাসের চরিত্রগুলো নদীকে পাশে নিয়ে এগিয়ে যায় সেখানে *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর চরিত্রগুলো ক্রমেই তিতাসকে আত্মস্থ করে নিজেরাই নদীর মতো বিকশিত হয়। কুবের-কপিলা কিংবা বিলাস-হিমির জীবনচর্যার উপলক্ষ নদী, তাদের টিকে থাকার আশ্রয় নদী। তারা যেন নদীকে নির্দিষ্ট শিল্পদূরত্ব থেকে অনুসরণ করে এবং এভাবেই এগিয়ে চলে তাদের অস্থির জীবনরথ। কিশোর, তার স্ত্রী কিংবা প্রজন্মান্তরের ধারায় এগিয়ে চলা অনন্ত — এরা যেন নদী-মানুষ; নদী এদের আয়ত্তে, নদীর আয়ত্তেও এরা। *পদ্মানদীর মাঝি* ও *গঙ্গা* উপন্যাসে নদীকে শিল্প-লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত করবার একটি উপায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। যা নদীপাড়ের মানুষদের জীবন-নিয়তির অংশ; তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনায়, সুখ-দুঃখে এমনকি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও নদীর এই স্পর্শ পাওয়া যায়। এর অপরপিঠে, *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের চরিত্রগুলো নদীর সঙ্গে অভেদ কল্পিত। যেমন, কিশোর পুরোপুরিই নদী-সর্মপিত একজন মানুষ। নদী তার স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে তাকে পাগল করে আবার এই নদীই স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে আরও নির্মমতার জন্ম দেয়। তিতাস নদী এই উপন্যাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের ধারাবাহিক বয়ে চলাকেই শনাক্ত করে। কিশোর আর অনন্ত যেন শেষ না হওয়া কোনো ভাটিয়ালি গান, নিঃসঙ্গ মাঝির কণ্ঠ বেয়ে সেই গানের সুর বেজেই চলে; আর এভাবেই অনিঃশেষ মূর্ছনায় এক নদী থেকে আরেক নদীতে গিয়ে মেশে। বর্তমান আলোচনার ধারাবাহিকতায় এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখকের কাছে নদী যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি আবার অন্তর্গত চেতনারও দ্যোতক। অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে

সময়ে *তিতাস একটি নদীর নাম* রচনা করেন, তখন বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যের সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ ও অনুশীলন বেশ জনপ্রিয়। 'কল্লোল যুগে'র সূত্র ধরে তখন ঋদ্ধ চেতনাকে ধারণ করে এদেশের কবিতা ও কথাসাহিত্যে দেশজ জীবনকাঠামোকে অভিনব শিল্প-অবয়ব প্রদানের প্রবণতা সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের উত্তরাধিকার বহন করেও অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজস্ব আকর, কৃষ্টির দ্বিরালাপ দিয়েই সংযোগ তৈরি করেন পাঠকের সঙ্গে। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* রচনার পরে কেন আরেকটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস লেখার প্রয়োজন দেখা দিল— এর কৈফিয়তে লেখক আনায়াসে বলতে পারেন— 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা- রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ২৭)। অদ্বৈত কোনো দূরবীক্ষণ-দৃষ্টি দিয়ে তিতাসকে দেখেননি। তিতাস আর তিতাস পাড়ের মালোদের সঙ্গে তাঁর যোগ শুধু আত্মিকই নয় তিনি এই পেশাজীবী সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারীও। তাই তিনি আরও সমৃদ্ধ আরও ঋদ্ধ এর নির্মাণে। বাড়ির পাশে পায়ে হেঁটে যাওয়া পথের মতনই, তিতাস-সংস্কৃতির প্রতিটি অলিগলি তাঁর চেনা; কোনো আয়োজন করে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা নয়, তিনি তিতাসকে দেখেছেন স্বচ্ছ জলের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখার মতো করে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সূত্রে অর্জিত জীবনকথাকে দার্শনিক ব্যঞ্জনায় অন্বিত করতে চেয়েছেন তিনি। এ তাঁর সচেতন শিল্পপ্রয়াস এবং এই জন্য নিজের ভাবাদর্শগত অবস্থান সম্পর্কে কোথাও তাঁর মনে অস্পষ্টতা নেই (তপোধীর, ১৯৯৯ : ৮৫)। উপন্যাসটির কাঠামোতেও সমাশ্রয়ী হয়েছে নদী আর প্রবাহিত জীবন। উপন্যাসটি তত্ত্বাশ্রয়ী হয়ে কোনো সমাজ-সত্য নিয়ে মাথা ঘামায় না বরং জীবন-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে বারবার; 'এ যেন সত্যের মত গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৪৭)। এটিই এই উপন্যাসকে বিশেষ করে তুলেছে।

৩.

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে মোট চারটি খণ্ড; এই চারটি খণ্ডে রয়েছে আবার দুটি করে এপিসোড। যদিও এই খণ্ড বিভাজন সম্পর্কে কেউ মনে করেন, প্রথম দুই খণ্ডের চারটি পর্ব বিবৃতিমূলক বাকিগুলো প্রতীকী (সুমিতা, ১৯৯৯ : ৩১)। তবুও শেষ বিচারে প্রতিটি খণ্ডের প্রতিটি পর্বই প্রতীকী হয়ে ওঠে। প্রথম খণ্ডের দুটি পর্ব হলো : 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাস খণ্ড'। দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি পর্ব হলো : 'নয়া বসত' ও 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ'। তৃতীয় খণ্ডের দুটি পর্ব : 'রামধনু' ও 'রাঙা নাও'। চতুর্থ খণ্ডের দুটি পর্ব যথাক্রমে 'দুরঙা প্রজাপতি' ও 'ভাসমান'। প্রথম খণ্ডের দুটি পর্বে লেখক তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন করেন। 'প্রবাস খণ্ড' পর্বটির তাৎপর্য বিশেষ রকমের। প্রবাসে কিশোর নামক চরিত্রটির যে অভিযান তাই প্রধান হয়ে ওঠে কাহিনি প্রবাহে। বস্তুত এই পর্বটি এমন একটি আখ্যান-অংশ; যা বহুস্বর তৈরি করে উপন্যাসের প্লটকে পরিপূর্ণ করে তোলে। প্রবাস জীবনে কিশোরের অকস্মাৎ পাওয়া মালাবদল-করা স্ত্রী আবার 'প্রবাস পর্বে'ই নিখোঁজ হয়। নয়াবসতের মধ্য দিয়ে সেই নারী আবার ফিরে আসে তিতাস পাড়ে। তবে কিশোরের স্ত্রী হয়ে নয়; সে আসে অনন্তের মা হয়ে। 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ' পর্বে

ঔপন্যাসিক মানব সমাজজীবনচক্রের তিনটি বিশেষ বাঁককে তুলে ধরেছেন। পরবর্তী চারটি পর্বের তিনটি পর্বের নাম নির্বাচনে রং-এর ব্যবহার রয়েছে। রংধনুর সাতটি রং 'রামধনু' শীর্ষক পর্ব আরও দিগন্ত বিস্তারী ও বর্ণিল; অনন্তের জীবনের ভাবি সময়ের লক্ষণগুলো এখানে স্পষ্ট। অনন্তের বৈশ্বিক যাত্রা শুরু হয় এই পর্ব থেকেই। এই পর্বে সে পায় তার বিকশিত সময়ের সখা বনমালীকে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় :

> অনন্ত চাহিয়া দেখে সচল চঞ্চল এক জনসমুদ্রের মধ্যে সে একা। বালক অনন্ত'র ইচ্ছা করে বনমালীর একখানা হাত ধরিতে (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৫৫)।

এই নির্ভরতার জোরেই অনন্ত একা পথে নেমে পড়ে। রামধনু কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে গেলেও অনন্তের মধ্যে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। 'রাঙা নাও' পর্বটির মধ্যেও আবার এক ধরনের বর্ণময় অভিযানের চিহ্ন সুস্পষ্ট। পর্বটির নাম শুনলেই রঙিন নৌকায় নতুন যাত্রার দৃশ্য ভেসে ওঠে। এ যেন আক্ষরিকভাবেই অনন্তের নবজীবন-অভিযাত্রার অংশ। এই পর্বের শেষে রয়েছে একটি গান; এটি যেন অনন্তেরই কথা — 'সকলের সকলি আছে আমার নাই গো কেউ/আমার অন্তরে গরজি উঠে সমুদ্দুরের ঢেউ/নদীর কিনারে গেলাম পার হইবার আশে/নাও আছে কাণ্ডারী নাই শুধু ডিঙ্গা ভাসে' — (অদ্বৈত, ২০১৩ : ২২০)। দুরঙা প্রজাপতির প্রতীকে লেখক অনন্তের জীবনের আরেক অধ্যায়কে যুক্ত করেন; এই পর্বে দুরঙা প্রজাপতির মতো অনন্তের জীবনেও সত্য হয়ে থাকে দুটি রং — মালোপাড়ার জীবন ও অজানা পৃথিবীর শিহরন।

> অজানা একটা রহস্যলোক তাকে নিরবধি হাতছানি দিয়া ডাকিত। আনন্দের একটা অনাকাঙ্ক্ষিত উন্মাদনায় তার মন এক এক সময় ভয়ানক চঞ্চল হইয়া পড়িত। শেষে শীঘ্রই একদিন সে তার প্রার্থিত বস্তুর সন্ধানে পথে পা বাড়াইল (অদ্বৈত, ২০১৩ : ২২৮)।

এই পর্বেই পরবর্তী পর্বের পরিণাম সম্পর্কে লেখকের পরিকল্পনা অনুমান করা যায়। মালোদের শ্লথ হয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক বন্ধন কোনো অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎকে যেন আরও নিকটে নিয়ে আসে। ভাসমান পর্বে লেখক অনন্তকে তিতাসের মধ্যে আবার স্থাপন করে পাঠকদের নিয়ে যান আরেক রূপান্তরে। এখানে অনন্তের জীবনে কোন স্থিরতাকে লেখক আবিষ্কার করতে পারেন না। অনন্ত কেবল দ্যোদুল্যমান সময়ের গতিমানব হয়েই রয়ে যায়। 'দেখে এতো বিশাল বিপুল সময়ের মহাস্রোতে সে বুঝি বা একখণ্ড দুর্বল কুটার মতই ভাসিয়া চলিয়াছে' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৯১)। তার এই প্রবহমানতাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে রয়ে যায়। এখানে নদী প্রতীক যেন অনন্তের অস্তিত্বের তাৎপর্য তুলে ধরে (সুমিতা, ১৯৯৯ : ৯৩)। আবার অনন্ত ও তার সঙ্গী অনন্তবালার মধ্যকার সম্পর্কও স্থিতি পায় না। পাঠক নিশ্চিতভাবে এই সম্পর্ক নিয়ে কোনো উপসংহারে পৌঁছতে পারে না।

বিভিন্ন পর্বের গঠন কাঠামো বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত দুটি পর্বই সর্বাধিক ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে; প্রবাস খণ্ড ও ভাসমান পর্ব। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে প্রবাস খণ্ডের মধ্য দিয়ে যে জীবন অভিযান শুরু হয়, তা আর কখনোই শেষ হয় না। তিতাস নদী রূপান্তরিত হয়ে খালে পরিণত হয়, জীবনের ধারাবাহিক বিন্যাসে কিশোরের পর অনন্ত আসে; তারপরও চলিষ্ণুতাই ধ্রুব হয়ে থাকে।

৪.

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই উপন্যাসে কাহিনি অগ্রসর হয় এপিসোডিক ভঙ্গিতে। একটি পর্ব সমাপ্ত হচ্ছে আর কাহিনি অগ্রসর হচ্ছে। একটা পর্ব থেকে আরেকটা পর্ব শুরু হচ্ছে আপাত এলোমেলোভাবে। একটি গ্রন্থির সঙ্গে অন্য গ্রন্থির বাঁধনটা কোথায় যেন একটু শিথিল। অনিবার্য কার্যকারণভিত্তিক জীবন রূপায়ণ যখন হিসেবি ঔপন্যাসিকের ধর্ম, অদ্বৈত যেন সেখানে একটু উদাসীন। যদিও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— 'বইখানি যেন নদীর পাঁচালি হয়ে উঠেছে। লেখক যেন এখানে কোন ব্যক্তির কাহিনীকে ধারণ করতে চান না। নদীর যেমন বিশেষের প্রতি কোন পক্ষপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছুর ঘাটে বাঁধা নয়।' (সরোজ, ১৯৯৫ : ৩২২)। তাঁর এই বক্তব্যে তিনি কাহিনিকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন কিন্তু আমরা বলতে চাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের যে বিকাশ তা-ও নদীর অনুসরণে এগিয়ে চলেছে। নদীর মতোই তার উপন্যাসের চরিত্রগুলো অপ্রত্যাবর্তনক্ষম, চলমান, বিবর্তমান। নদী যেমন উৎসের দিকে কখনো ফিরে আসে না, উপন্যাসের চরিত্রগুলো তা-ই। কিশোরের হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীরূপে সন্তানসহ ফিরে আসার মধ্য দিয়ে যে মেলোড্রামা সৃষ্টি হতে পারত অনন্ত ও তার মাকে ঘিরে, তাকে এড়িয়ে গিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনায়াসে নিরাসক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। তাই অনন্তের মা কিশোরকে চিনতে পেরেও বা বিশেষ ঘটনা-পরম্পরায় উন্মাদ কিশোর সুপ্ত-স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েও স্থূল পুনর্মিলনের মেলোড্রামাটিক পরিণতির দিকে উপন্যাসটি ধাবিত হয় না; এ যেন শুধু সম্মুখ পানে বয়ে যাওয়া। তাহলে কিশোরের উন্মাদনা কি তিতাসের উন্মাদনা! লেখক কি অতিসচেতনভাবেই কিশোরের মধ্যে তিতাসের ছবি এঁকে নিয়েছেন? এখানে তিতাসের আর কিশোরের তুলনামূলক বর্ণনা স্মরণ করা যেতে পারে। তিতাস শাহি মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নেই, নেই কৃপণের মতো কোনো কুটিলতা। কিশোরও নদীর মতো অকৃপণ উদার — তার কুটিলতা নেই — অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে বলেই কিশোর-বাসন্তীর চৌয়ারিটা ছেড়ে দেয় সুবলের জন্য। তাই বাসন্তীর আক্ষেপ— 'বন্ধুর জন্য চোখ বুজিয়া ভাল জিনিস এমন ছাড়িয়াও কেউ দেয় না (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৫৪)। 'প্রবাস খণ্ডে' আর্বিভাব ঘটে কিশোর চরিত্রটির। তখন কিশোরের কৈশোর-কাল আর তিতাসেরও কৈশোর কাল। তিতাসের বুকে অতল জলের ঠাঁই স্পর্শ করে এগিয়ে যায় কিশোর। কিশোরের জীবন-অভিযান শুরু হয় তিতাসের বুক থেকেই। কিশোর চরিত্রটিকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ নদীস্বভাবী মানুষের গুণাবলি দিয়ে সুনিপুণ করে এঁকেছেন। কিশোর তিতাসের মতো দরদি। মানুষ থেকে শুরু করে ধানের চারা সবকিছুর প্রতি সে বোধ করে অকৃত্রিম মমত্ববোধ। —'বাঁশটা আস্তে চালাইও তিলক। ধানগাছ নষ্ট না হয়' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৬৮)। 'সাঁ সাঁ করিয়া বসন্তের বাতাস বহিয়া যায়, স্বচ্ছ জলের উপর ঢেউ তুলিয়া। কিশোর ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হইয়া যায়। নদীর তা তা থৈ থৈ নাচনের সঙ্গে তার বুকখানাও নাচিয়া উঠে' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৬৯)। এভাবেই নদীস্বভাবী কিশোরের বিকাশ ঘটতে থাকে। 'আকাশের রোদ যখন সুবল-তিলকের মাথার উপর পড়ে তখন সে একই রোদ যেন নদীর বুকে পড়ার মতো কিশোরের বুকেও সোনার মতো ঝরে পড়ে' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৬৯)।

কিশোর যেন তিতাসেরই অন্য নাম। এভাবেই কিশোরের জীবনের নানা টানাপড়েনে একমাত্র সত্য হয়ে থাকে তিতাস। এই তিতাসের বুকেই তার চেতনা লোপ পেয়ে সে মানসিক ভারসাম্য হারায়। আবার নদীর মতোই অনন্যগতি হয়ে শেষ হয় তার জীবন-প্রবাহ। এই প্রবাহের মধ্যে আলোড়ন তোলে অনন্তের মা; যেন নদীতে ঝড় তুলে ঘরে বা স্মৃতিতে ফেরানোর চেষ্টা। কিন্তু নদীর মতোই নিয়ম মেনে সেই ঝড়ে আত্মসমর্পণ করে কিশোর; নদীতেই বিলীন হয় সে। বলা যায় যে, লেখক অত্যন্ত যত্ন করে তিতাস-প্রতিমার আশ্রয়ে কিশোরকে গড়েছেন। তিতাসকে তিনি আরও সত্য আর জীবন্ত করে তুলেছেন কিশোর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। তাই বুঝি কিশোরের মৃত্যু, অনন্তর আবির্ভাব, মালো সংস্কৃতির চিড় ধরা পরিণতি আর তিতাসের রূপান্তর একই অবিচ্ছেদ্য সুতায় গাঁথা।

এই উপন্যাসের নদীময় প্রেক্ষাপট এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ সমস্বরে অন্বিত। উপন্যাসের আখ্যানের মাঝ-পর্যায়ে উপস্থিত হয় অনন্ত। সে নদীর মতোই বইবে বলে তাকে পিছুটানের অনুভবকে পরিহার করতে হয়েছে। জীবনের শুরুতে মা-বাবা গত হওয়ায় জন্মঋণের বিষয়টি তার অগোচর; তাই মা গত হওয়ার পরে অনন্ত মাসিকে আশ্রয় করে, আবার একসময় মাসিকে ছেড়ে অনন্ত উদয়তারা-বনমালীর পরিচর্যার অংশ হয়েও তাদের সাথে জীবনকাটায় না। নদীকে যেমন গতির টানে উৎসকে ছেড়ে আসতে হয় তেমনি অনন্ত কেও ছেড়ে আসতে হয় মালো পাড়া; সে যেন জন্ম থেকেই নদীর মতো প্রবাসী। অনন্ত নদীর মতো করে পথ চলে তাই 'আ-ঘাটাতে ঘাট হয়, আ-পথে পথ হয়, আ-কুটুমে কুটুম হয়' তার (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৮৯)। অনন্তের জীবনের প্রতিটি বাঁক-ই যেন এই কথাটির সত্যতা প্রতিধ্বনিত হয়। জীবনের শুরুতে নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ তাকে ও তার মা-কে বাঁচিয়েছিল। এরপর এদের হাত ধরেই তিতাস পাড়ে এসে পৌঁছায় অনন্ত আর তার মা। অনন্ত যেদিন প্রথম তিতাসের সান্নিধ্যে আসে তখন তার অনুভব ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

> তার চোখের সামনে জাগিয়া রহিল শুধু একটা নদী। সে নদী তার সকাল সত্তাকে, সারা অনুভূতিকে, সূতাতন্ত্রর মত টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ভূত-ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া সে এই সদ্যজাগ্রত মুখর বর্তমানের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তার প্রকৃত যাত্রা শুরু যখন হইয়াছে এইখান থেকে (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৯১)

এসময় থেকেই অনন্ত ক্রমান্বয়ে কিশোরের নদীজীবনের উত্তরাধিকার বহনের মধ্য দিয়ে এক নিজস্ব নতুন জলধারা-প্রতিম জীবন-প্রবাহে নিজেকে মিশিয়ে নেয়। এই চলমানতার ধারায় অনন্তের মা মৃত্যুবরণ করলে সে পায় মাসীর ঠাঁই। মাসীর আশ্রয় থেকেও সে একদিন বাইরে এসে দাঁড়ায়। মুক্তির আনন্দ, নতুন পৃথিবী দেখার স্বপ্ন তাকে বিমোহিত করে। চকিতের জন্য মনে হতে পারে *পথের পাঁচালী-অপরাজিত* উপন্যাসের মাতৃপিতৃহারা অপুর নির্ভার মনোভঙ্গির সঙ্গে অনন্তকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অদ্বৈত তাঁর শিল্পীমানসে কেবলই নিজস্বতার সারথি। তাই মুক্তির আনন্দ অনন্তকে সহসা মীমাংসিত করে না। স্বল্পসময়ের ব্যবধানেই সে গভীরভাবে একাকিত্বে আক্রান্ত হয় :

> আপনজন না থাকার ব্যাথায় তার জগৎ পরিম্লান। আকাশে তারা আছে, কাননে ফুল আছে। মেঘে রঙ আছে। তিতাসের ঢেউয়ে সে রঙের খেলা আছে, সব কিছু নিয়াও এই রূপোন্মত্ত বহির্বিশ্ব তার মনের ম্লানিমার সঙ্গে একাকার। একটার পর একটা সাগরের ঢেউয়ের মত কি যেন তার সারা মনটা ডুবাইয়া চুবাইয়া দেয়। তখন সে চাহিয়া দেখে, কূল নাই সীমা নাই। খালি জল আর জল। দুই তীরের বাঁধনে বাঁধা তিতাসের সাধ্য কি সে জলে আগলায়। এ যেন বার-দরিয়ার নোনা জল, ছোট তটিনীর সকল নৃত্যবিলাসকে তলাইয়া দিয়া জাগিয়া থাকে শুধু একটানা হাহাকার (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৯১)।

মালোপাড়া ছেলে অনন্তের প্রথম আশ্রয় হয় তিতাসের বুকে গেরাপী দিয়ে রাখা নৌকায়। অনন্তের মনে হয় — 'এখানে অনন্ত চিরদিন কাটাইয়া দিতে পারিবে।' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৬৬)। আবার উদয়তারার গ্রামে যাওয়ার সময় তিতাসের সান্নিধ্যে তার নিবিড় মনোপোলব্ধি —

> নদীর স্রোত তাহাকে দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া নিবে, ঢেউ তাহাকে দোলা দিবে। চারিদিকের আঁধারে কেউ জাগা থাকিবে না। জাগিয়া থাকিবে সে আর তার চারিদিকে আঁধার আর উপর আকাশের তারাগুলি (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৭৭)।

অনন্তের এই নদীময় চিন্তা পাঠককে আনায়াসে যুক্ত করে দেয় ঔপন্যাসিকের মনোপথের সঙ্গে। অনন্তের মধ্যে আমরা পাই শুধুই সামনের দিকে চলার প্রবণতা। যা নদীরও চলার পথের মূলমন্ত্র। তাই তো অনন্ত পা বাড়ায় অন্য জগতের আকর্ষণে। অনন্তের মালোপাড়া থেকে চলে যাওয়া এবং মালো সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া সংস্কৃতির টানাপড়েন প্রায় একই সময়ের ঘটনা। এসময় মালোরা নিজস্বতা হারাতে বসেছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে : 'এতে করে নতুন ধরনের হালকা ভাবের হালকা কবির গান আসিয়া সে সব গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রাণময়; ভাবসম্পদময় গানের স্থান অধিকার করিতেছে (অদ্বৈত, ২০১৩ : ২৩১)।' এতসব পালাবদলের মধ্যে তাদের অস্তিত্বের প্রতীক তিতাসও শুকিয়ে যেতে থাকে। এক সময় তিতাসের চর জাগে। মালো সমাজের স্বজাতিক অস্তিত্ব এসে দাঁড়ায় সায়াহ্নে। তিতাসের এই পরিণামে আগমন ঘটে অনন্তের; এ কোনো প্রত্যাবর্তন নয়। কেননা, যে অনন্ত মালোপাড়া থেকে গিয়েছিল আজকের অনন্তের সঙ্গে তার অনেক তফাত। এই অনন্ত শিক্ষিত মালো সন্তান অনন্ত। ঋতুর পালাবদলে শুকিয়ে যাওয়া তিতাসের বুকে বর্ষার জল আসে আর অসহায় মালোদের কাছে ফিরে আসে অনন্ত মৃত্যু-সঞ্জীবনী হয়ে। প্রাবন্ধিক সুশান্ত দাস এজন্যই বলেছেন— 'কথাকার এ-ও দেখিয়েছেন, তিতাসের সাথে সাথে মালো-জীবনের এক সমাপতন ঘটেছে। আর সেই সমাপতন দেখাতে গিয়েই কোনও পরিণতি সম্ভাবনার উপস্থিত করেননি। তবে অব্যক্ত রূপক-এ অনন্তকে তার প্রতিনিধি অদ্বৈত করে গেলেন।' (সুশান্ত, ১৯৯৯ : ১৬৫) অনন্ত যর্থাথভাবেই তিতাসের প্রতিনিধি। তিতাস নদীতে তখন মানবসৃষ্ট ও প্রকৃতিসৃষ্ট নানা কারণে মাছ ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না; লক্ষ করা যাবে যে, এই অনন্ত মালো হয়েও কোনদিন মাছ ধরার স্বপ্ন বুনে না। তিতাসকে আমরা পাই কিন্তু পাই না তার যৌবনের বুনো গন্ধ; তাকে ঘিরে তখন কেবলই ভূমির উল্লাস। তিতাস শেষ পর্যন্ত টিকে আছে তার নামের মধ্যে ক্ষীণ স্রোতধারায়; আর অনন্তের নদীময়তা টিকে আছে তার মালো পদবিতে। তার স্মৃতিতে, সত্তায় জেলে-জীবনের ঘ্রাণ

থাকলেও বাস্তবে তা হত অবসিত। বাস্তবের অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন-পরিণতিও এর সঙ্গে অভিন্ন। অদ্বৈত তো কোনো রাখ-ঢাক না রেখেই উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক করে তুলেছেন। আর তাই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাত দিয়ে অদ্বৈত আর অনন্তকে একাকার করে দেওয়া একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এক্ষেত্রে লক্ষণীয় :

> জীবন তো একটা ছোট গল্প নয় — তার অনেক জট — অনেক জটিলতা। মরার আগে বন্ধু কল্যাণকে অনন্ত বলেছিল কাঁচড়াপাড়া টি.বি. হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে 'মনে আছে সেই কুমার? মনে আছে জেলেডিঙি? আজ আবার গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে সেই ডিঙির ওপর। লাল গামছা মাথায় জড়িয়ে ভেসালে উঠে জাল ফেলে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। সবাই তো আমরা জাল ফেলেই বসে আছি কল্যাণ। কারো জালে মাছ পড়ে, কারো জালে পড়ে না। কারো জালে চুনোপুঁটি, কারো রুই-কাতলা। যার যতটুকু ক্ষমতা, যার যতটুকু সাধ্য। কিন্তু জাতে আমরা সবাই এক। সবাই জেলে।'(সরোজ, ১৯৯৯ : মুখপাত)

এই ভাষ্যের মধ্য দিয়ে আমরা অনন্তরূপী অদ্বৈতের জীবন-দর্শন খুঁজে পাই। তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমিজীবী-জলজীবীরা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বাইরে যেতে পারেনি। অদ্বৈত এই পরিণতি দ্বারাই বেশি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি যেমন বিশ্বাস করেছেন 'সকলেই আমরা জেলে', আবার এই সত্য তাঁর অজানা নয় যে, সবার জালে সমান মাছ পড়ে না। কিন্তু জাল ফেলে বসে থাকাই জীবনের অংশ, সত্তার অংশ। অনন্তের জীবনের জাল তাই বুঝি কখনোই আর তিতাস থেকে গুটিয়ে নেয়া হয় না।

৫.

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে নদী-অনুসারী প্রবহমান জীবনের যে প্রতিবেদন উপস্থাপিত তার ভিত্তিমূলে লোকজ মিথের অস্তিত্ব বিদ্যমান বলে চিহ্নিত করেছেন একাধিক গবেষক। বাংলা উপন্যাসের আখ্যান বিনির্মাণে পুরাণ-মঙ্গলকাব্যের ফর্মের আধুনিক উত্তরাধিকার বহন করবার ক্ষেত্রে আলোচ্য উপন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বিবেচিত (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৯ : ৩)। সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯৯ : ৩২)-এর মতে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই মঙ্গলকাব্য-প্রতিম গঠনকৌশলটি গ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। মঙ্গলকাব্যের সূত্র ধরে এই রচনায় মনসা মিথের প্রসঙ্গ এসেছে; নদীজীবনের সঙ্গে এই মিথের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। মিথের বিনির্মাণের ধারাবাহিকতায় লক্ষ করা যায় যে, এই উপন্যাসে কৃষ্ণ মিথের অনুষঙ্গও এসেছে বারবার; এমনকি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও মিথকে সমন্বিত করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। কিশোর আর সুবলের নাম নির্বাচনের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের মিথিক ব্যঞ্জনা। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ শ্যামল কিশোর আর সখা সুবল। যেন আপনা থেকেই মূর্ত হলো কিশোর ও সুবলের মধ্যে (সুমিতা, ১৯৯৯ : ৩৩)। তাই কিশোরের জীবন-অভিযানেও পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের মিথিক আবহ। কিশোরের আবির্ভাব ঘটে প্রবাস খণ্ড আখ্যানে। 'প্রবাস'— এই আইডিয়াটির মধ্যে রয়েছে ভিন্ন মাত্রার মিথিক তাৎপর্য। কৃষ্ণের বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরাতে যাওয়াও এক রকমের প্রবাস। এই খণ্ডেই এক সাধুর সঙ্গে কথোপকথনের একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে লক্ষণীয় : '[সাধুর জিজ্ঞাস্য]..তোমরা বিরাজ কর বৃন্দাবনে না কৈলাসে — তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী না শিবমন্ত্রী। তিলকের উত্তর আমরা

বাবা কৃষ্ণমন্ত্রী। [পুনরায় সাধুর ভাষ্য:] ....তিনি লীলা-বৃন্দাবনে আইসা সুবলাদি সখা আর ললিতাদি সখীসহ আদ্যাশক্তি শ্রীমতি রাধিকারে লইয়্যা লীলা কইরা গেছেন' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৬১)। কিশোরও 'সুবলাদি সখাসহ' যেন শ্রীরাধিকার সঙ্গে লীলারত। সাধুকে তারা যা দিয়ে যায় নিয়ে যায় তার চেয়ে ঢের। তাই সম্ভবত সাধুর স্বগতোক্তি 'বৃন্দাবনের চিরকিশোর তোমরা...।' খলাতে কিশোরের দেখা হয় এক অপরিচিতার সঙ্গে আর অপরিচিত ফুল মুগরাচণ্ডীর সঙ্গে। এই পরিচয়ের চরম প্রকাশ ঘটে দোল-পূর্ণিমার কালে। পুরাণে রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ এই সময় ব্রজের গোপীদের নিয়ে হোলি বা রং খেলায় মেতে উঠতেন; যার অন্যতম একটি হেতু ছিল রাধিকার সান্নিধ্য লাভ আর ফাগে গুলালে মনের রং-কে প্রকাশ করা। এই দোলপূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে রাঙায়। ঠিক তেমন করেই হোলি খেলার ধুম পড়ে শুকদেবপুর খলাতেও। খলার নারী আর গ্রামের নারীরা একাকার হয়ে সবাই সবাইকে রাঙিয়ে যায়। কৃষ্ণের দলের গান আর রাধার দলের গানের মতো একটি সুরও বিনিময় হয় কিশোর আর এক অপরিচিতার মধ্যে। সেইসঙ্গে ঘটে যায় আরও কিছু :

> কিশোরকে একে একে অনেকেই আবির দিল কিন্তু গোলমালে ফেলিল আর একজন। ...সে অবিবাহিতা মেয়ে যার যৌবনের সব চিহ্ন দেহে ফুটছে।....কিশোরের গালে আবির দিতে মেয়েটার হাত কাঁপিল; বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তার ছন্দময় হাতখানার কোমল স্পর্শ কিশোরের মনের এক রহস্যলোকের পদ্মরাজের ঘোমটা-ঢাকা দলগুলিকে একটি একটি করিয়া মেলিয়া দিল। সেই অজানা স্পর্শের শিহরণে কাঁপিয়া উঠিয়া সে তাকাইল মেয়েটির চোখের দিকে, সে চোখে মিনতি। সে মিনতি বুঝি কিশোরকে ডাকিয়া বলিতেছে; বহু জনমের এই আবিরের থালা সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমারই জন্যে 'তুমি লও। আমার আবিরের সঙ্গে তুমি আমাকেও লও (অদ্বৈত, ২০১৩ : ৭৪)।

এ যেন কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীরই আকুল আবেদনের স্বর হয়ে পাঠককে উদ্দীপিত করে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বাঁকের সঙ্গে নদীময় জীবনের বাঁক মিলিয়ে ঔপন্যাসিক আখ্যান বয়ন করে চলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-মিথের এখানেই সমাপ্তি ঘটে না। উপন্যাসের পাঠে আবারো গতিময় হয়ে ওঠে কৃষ্ণ-মিথের প্রসঙ্গটি। এই প্রসঙ্গে গুণময় মান্না বলেন, 'মালোরা কৃষ্ণমন্ত্রী — বৈষ্ণব দর্শনের ভাবমণ্ডল তাদের জীবনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো সহজ ক্রিয়াশীল .... গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমিক; কিন্তু সে প্রেম আত্মকামশূন্য' (গুণময়, ১৯৯৯ : ৭৭)। আমরা তেমনই প্রেম পাই বাসন্তী আর অনন্তবালার মধ্যে। বাসন্তীর মধ্যে শুধু বিদ্রোহী নারী বাস করে এমন নয়। সে অনন্তের যশোদা মা। এ কারণে সে অবলীলায় বলতে পারে, 'দুত্তোরি যামুনা রাধামাধবেরে আবির দিতে। তারে আবির দিয়া লাভ কি। আয়রে অনন্ত। ঘরে গিয়া সে অনন্তকে আবির মাখাইল' (অদ্বৈত, ১৩৪)। বাসন্তী কামনাশূন্য হতে চায় এবং নিজেকে বিকশিত করতে চায় অনন্তের মাসী হিসেবে — 'পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। ...এই অনন্তই আম্‌রার আশা-ভরসা। দুইজনে এরেই মানুষ কইরা তুলি চল' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৩৫)। বাসন্তী তার চিরকালীন মাতৃত্বের তৃষ্ণা মিটাতে চেয়েছে অনন্তকে আশ্রয় করে। তারপর অনন্তের নদীস্বভাবী জীবন আবারও বাঁক নেয়। সে নিরুদ্দেশ হয়। গাঁয়ের কেউ তার হদিস দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পায় বনমালী; তিতাসের বুকের ভিতরে। বনমালীর সঙ্গে বনমালীরই গ্রামে চলে যায় অনন্ত। সেখানে সাধুজি তার মধ্যে কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে বলেন — 'অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না

পাইয়া'; আমি দান জানি না, ধ্যান জানি না, সাধ জানি না, ভজন জানি না; — কেবল তোমারেই জানি, ধরা যখন দিছ, আর ছাড়ুম না তোমায়' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৮১)। কৌশলে ঔপন্যাসিক আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, অনন্তও কিন্তু কৃষ্ণেরই আরেক নাম। ঔপন্যাসিক সরাসরি এনেছেন এই মিথ প্রসঙ্গ। কৃষ্ণ যেমন বারবার বিভিন্ন অবতার হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন সেই ধারাবাহিকতার অনুসরণে কিশোর নবরূপে আবির্ভূত হয় অনন্তর মধ্যে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় : '...যশোদা তোমারে পুত্ররূপে পাইয়া কাঁদছিল, শচীরানী তোমারে পুত্ররূপে পাইয়া কাঁদছিল, রাজা দশরথ তোমারে পুত্ররূপে পাইয়া কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিল, তবুও তোমারে পুত্ররূপে পাওয়ার মধ্যে কত তৃপ্তি কত আনন্দ' (অদ্বৈত, ২০১৩ : ১৮১)। এভাবে অনন্তের মধ্যে কৃষ্ণ মিথের স্পষ্ট ধারণা দিয়ে যান ঔপন্যাসিক। একইভাবে অনন্তবালার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সে চিরবিরহিনী রাধা। অনন্তের অপেক্ষায় সে তার নিজের দিকে তাকানোর অবসর পায় না; শূন্য বৃন্দাবনে সে খুঁজে ফিরে তার প্রেমকে। রাধার ছিল যমুনার তীর, অনন্তবালাও তেমনি বেছে নিয়েছে তিতাস-কূল। তবে কী তিতাস যমুনার উত্তরাধিকার হয়ে চিরন্তন প্রেমকে বহন করে চলেছে— এই প্রশ্ন যেমন পাঠকের নিকট উত্থাপিত হতে পারে ঠিক একইভাবেই ব্রজবালার বিরহী প্রতিমাকেও পাঠক অনায়াসে স্থাপন করতে পারেন এই তিতাসচারিণীর মধ্যে।

৬.

উপন্যাসটির আখ্যান, চরিত্রায়ণ কৌশল কিংবা মিথিক আবহ — যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তিতাস নদী। কিশোর কিংবা অনন্তের স্বভাবে সম্পৃক্ত থেকেছে তিতাস; তাদের অভিযাত্রা, পরিণতি — এ সকলকিছুই তিতাস নদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে বহুমাত্রিক মিথিক অনুষঙ্গ এই উপন্যাসের অন্তঃস্রোতে বিদ্যমান তাকেও ঔপন্যাসিক মিলিয়ে দিয়েছেন জলপ্রবাহের প্রতীকতায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে কখনও এই মিথ প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, অদ্বৈত এই উপন্যাসে এক প্রত্নসময়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পান, যা পাঠককে অনাস্বাদিত এক শিল্পভুবনের হাতছানি দেয়। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জীবনের সোঁদা গন্ধকে নদীর গভীরতায় অনুসন্ধান করেন, হয়তো পেয়েও যান। জীবনের অঙ্ককে সরলীকৃতরূপে ভাগ করে নিতে চান নদীর সঙ্গে। তাই কিশোর আর অনন্ত চরিত্র দুটি বিকশিত হয় নদীর মতো যার পরিণতি ঘটে নদীর মতোই। কিশোর এবং অনন্তকে যেমন তিতাস যুক্ত করেছে তেমনি উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলোকেও এই তিতাস অপরিহার্যতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এর মধ্য দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তিতাস নদীকে ঘিরে বয়ে চলা জনপদের ডিসকোর্স।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০১৩, ৪র্থ প্রকাশ), *তিতাস একটি নদীর নাম,* শান্তনু কায়সার সম্পাদিত। বুক ক্লাব, ঢাকা।

গুণময় মান্না (১৯৯৯), 'অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা ।

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৯), *উপন্যাসের প্রতিবেদন*। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা ।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৯), 'তিতাস একটি নদীর নাম : আখ্যানের বহুস্বর' *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

শুভঙ্কর ঘোষ (১৯৯৯), 'ব্রাত্য জীবনের কথকতা : কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ', *তিতাস একটি নদীর নাম প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস (সম্পাদিত), পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৫), *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৯), 'তিতাস একটি নদীর নাম প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ-এর মুখপাত', *তিতাস একটি নদীর নাম প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস (সম্পাদিত), পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯৯), ' তিতাস একটি নদীর নাম : ভাষা ও প্রকরণ', *তিতাস একটি নদীর নাম প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস (সম্পাদিত), পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

সুশান্ত দাস (১৯৯৯), 'তিতাসের নায়ক : একটি ঔপন্যাসিক গুরুত্ব', *তিতাস একটি নদীর নাম প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস (সম্পাদিত), পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।